International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 11-19
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.263

‘প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে’: ময়মনসিংহ-গীতিকায় প্রেমপত্র

ড. পারমিতা ব্যানার্জী মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চিত্তরঞ্জন কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 03.04.2026; Accepted: 06.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Maymansingha Gitika, a master-piece literary genre of the medieval history of Bengali Literature. In the time of Vaktibad (Religious Atmosphere) this literary-genre tried to depict the inner-heart of women, who were totally confined by the social & religious barriers. Malua, Kamala, Rupabati, Sonai, Chandrabati– each of them overcoming their obstacles tried to move in the path of love. Especially, Chandrabati became betrayed by her beloved. But, she overcomed the situation and gave the history authoring Ramayana, which is renowned by ‘Chandrabati’s Ramayana’. The ways and medias of love letters in Maymansingha Gitika are very much unique and praiseworthy. The language of love-letters is very simple but heart-touching. By these love-letters of Maymansingha Gitika we can find the social structure, as well as the religious atmosphere of that time. So, these letters are very significant till today.

Keywords: Maymansingha Gitika, Love-letters, Social Structure, Religious Obstacles, Inner-heart of Women

এখন এস.এম.এস-এম.এম.এস-এর যুগ। ই-মেল-এর যুগ। এখন যুগ ফেসবুকের, নানান সোশ্যাল নেট-ওয়ার্কিং-এর। না, এখন আর কালিও লাগে না, কলমও লাগে না, লাগে না কাগজও। পত্র তো দূরের কথা, আমরা পেরিয়ে এসেছি চিঠির যুগকেও। গাছের পাতায় লেখা হত বলেই নাম হয়েছিল পত্র। কাগজের যুগ আসার পর আর পত্র রইল না– হল চিঠি। অবশ্য আমরা বিস্মৃত হইনি, কাগজের উৎসেও আমাদের যেতে হয় গাছের কাছে। কিন্তু সে-সব কথা থাক, আমরা বলতে চাইছি চিঠি বা পত্র আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। (অবশ্য অফিসিয়াল লেটার আজও অনেকক্ষেত্রে গুরুত্ব বজায় রেখেছে) কিন্তু এর গুরুত্ব একসময় যথেষ্ট ছিল। কাজ-কারবারে তো বটেই, বিশেষত প্রেমের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ছিল অভাবনীয়। মনের কথা কিভাবে প্রকাশ করা যায়, কিভাবে প্রেমিকা বা প্রেমিককে প্রেমের পথে চালিত করা যায় তার অন্দিসন্ধির ইতিহাস লুকিয়ে থাকে প্রেমপত্রে। তথাকথিত বাংলা শিষ্ট সাহিত্যে, বলা ভালো আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পত্র তথা প্রেমপত্রের ব্যবহার সীমিত হলেও একান্ত কম নয়। সংখ্যার দিক থেকে যেমন তেমনি সাহিত্যিক সৌন্দর্যের দিক থেকে সেইসব পত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এপ্রসঙ্গে আমাদের সহজেই স্মরণে আসে বাংলা আধুনিক সাহিত্যের দুই অগ্রণী ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি– সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস এবং কবিশ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে অনেক সাহিত্যিকের রচনায়, বিশেষত

উপন্যাস ও ছোটোগল্পে প্রেমপত্রের সার্থক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে পত্রের ব্যবহার সেইভাবে আর চোখে পড়ে না। মধ্যযুগের কাব্যে পত্রের ব্যবহার ছিল আরও সীমিত। সেই হিসেবে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ময়মনসিংহগীতিকা।

দীনেশচন্দ্র সেন থেকে শুরু করে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ক্ষেত্র গুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পল্লব সেনগুপ্ত, বরুণকুমার চক্রবর্তী, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যবতী গিরি, উদয়কুমার চক্রবর্তী, সৌমিত্র বসু, তাপস বসু, রবীন্দ্রনাথ পাল, আশিস ঘোষ, মুনমুন চট্টোপাধ্যায়, অজন্তা মিত্র প্রমুখ ময়মনসিংহ-গীতিকার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁদের কেউ কেউ আলোচনা করেছেন এর রচনাকাল তথা ঐতিহাসিক দিকগুলি নিয়ে; কেউ কেউ আলোচনা করেছেন এর বিষয়ভিত্তিক নানাদিক– সাহিত্য গুণ, চরিত্র-চিত্রণ, নায়ক-নায়িকা, নাটকীয়তা, গীতিধর্মিতা, সমাজবাস্তবতা, ইত্যাদি; কেউ কেউ বা রূপতাত্ত্বিক ও গঠনতাত্ত্বিক দিকে আলোকপাত করেছেন। আমাদের আলোচনার জায়গা হল ময়মনসিংহগীতিকার প্রেমপত্র বিষয়ে। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য বরুণকুমার চক্রবর্তীর একটি উক্তি:

> "আমাদের গীতিকাগুলির প্রধান উপজীব্য বিষয় হ'ল প্রেম– ব্যর্থ ও অভিশপ্ত প্রেমের কাহিনীই মূলতঃ রূপায়িত হয়েছে গীতিকাগুলিতে।"[১]

এই কথা মাথায় রেখেই আমাদের প্রবন্ধের এগিয়ে চলা। প্রেম যেখানে মুখ্য বিষয় সেখানে প্রেমপত্র আলাদা এক আলোচনার আবেদন রাখে বলেই মনে হয়। প্রেমপত্র ব্যবহারের নানা দিক নিয়ে আলোচনাই আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

।২।

প্রথমেই আমরা দেখে নিতে চাইব: কোন্ পালায় ক'টি পত্রের প্রয়োগ ঘটেছে, সেগুলি কে কাকে কী উদ্দেশ্যে লিখেছে। নীচের তালিকা থেকে আরও একটি দিক স্পষ্ট হয়ে যাবে - ব্যবহৃত পত্রগুলির মধ্যে ক'টি প্রেমপত্র ময়মনসিংহ-গীতিকায় রয়েছে।

পালার নাম	পত্র-সংখ্যা	প্রেমপত্র-সংখ্যা	পত্রের প্রকৃতি
মলুয়া	২	০	১. মলুয়া ভাইদের পাঠিয়েছে দুশমন কাজীর হাত থেকে স্বামী বিনোদকে রক্ষার জন্য। ২. মলুয়া ভাইদের পাঠিয়েছে কামুক দেওয়ান জাহাঙ্গীরের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য
কমলা	৪	১	১. চিকন গোয়ালিনীর হাত দিয়ে কারকুন পাঠিয়েছে কমলাকে প্রেম-প্রস্তাব জানিয়ে। ২. কারকুন পাঠিয়েছে জমিদারকে চাকলাদারের মোহরপ্রাপ্তির মিথ্যা খবর জানিয়ে। ৩. কারকুন পাঠিয়েছে কমলার মামাকে কমলার বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতার অভিযোগ জানিয়ে তাকে বাড়িতে জায়গা না দেওয়ার জন্য (পরোক্ষে হুমকি দিয়ে)। ৪. কমলার মামা কমলার মামীকে পাঠিয়েছে কমলাকে

			আশ্রয় না দেওয়ার পরামর্শ জানিয়ে।
রূপবতী	১	০	১. রূপবতীর মা পাঠিয়েছে স্বামীকে মেয়ের বিবাহের তাগাদা দিয়ে।
দেওয়ান-ভাবনা	৪	২	১. মাধব পাঠিয়েছে সুনাইকে প্রেম-প্রস্তাব হিসেবে। ২. সুনাই পাঠিয়েছে মাধবকে প্রত্যুত্তর হিসেবে, সম্মতি জানিয়ে। ৩. দেওয়ানের সঙ্গে যাতে বিয়ে না হয় সেই আর্জি জানিয়ে সুনাই পাঠিয়েছে মাধবকে (চিঠির বর্ণনা অবশ্য নেই) ৪. মাধব আশ্বস্ত করে লিখেছে সুনাইকে।
চন্দ্রাবতী	৬	৬	১. চন্দ্রাকে পাঠিয়েছে জয়ানন্দ বিবাহ প্রস্তাব হিসেবে। ২. চন্দ্রা প্রত্যুত্তর জনিয়েছে কিছু বাধা ও প্রতিকূলতা জানিয়ে, তবে নিজের সম্মতি তাতে প্রকাশিত। ৩. জয়ানন্দ পাঠিয়েছে এক মুসলমানীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে। ৪. অনুতপ্ত জয়ানন্দ চন্দ্রার কাছে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে। ৫. পিতার আজ্ঞায় চন্দ্রা ক্ষমা না করে পত্রাঘাত করেছে জয়ানন্দকে। ৬. আত্মহত্যার আগে জয়ানন্দ মন্দিরের কপাটে লিখেছে বিদায়লিপি চন্দ্রার উদ্দেশ্যে।

তালিকা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ময়মনসিংহ-গীতিকার মোট পাঁচটি পালায় পত্রের ব্যবহার ঘটেছে। মোট পত্রসংখ্যা= ১৭। তার মধ্যে প্রেমপত্রসংখ্যা= ৯, 'কমলা' পালায় একটি, 'দেওয়ান-ভাবনা'য় দু'টি এবং 'চন্দ্রাবতী'-তে ছ'টি।

। ৩ ।

'কমলা' পালায় প্রেমপত্র একটি-ই। কিন্তু পরবর্তী তিনটি পত্র প্রথম প্রেমপত্রটির পটভূমিতেই বিচার্য। কারকুন চিকন গোয়ালিনীর মারফতে প্রেমপত্র পাঠিয়েছে তারই মনিবকন্যা কমলা-কে। এই আবেদন মূলত কামতাড়িত হলেও পত্রের ভাষা ফেনায়িত প্রেমমূলক–

" ... কন্যা আরে শুন দিয়া মন।
তোমার লাগিয়া মোর মন উচাটন।।
কির্‌পা কইর‍্যা কন্যা একবার চাও মোর পানে।
পরাণে বাঁচাও মোরে ভরা যৌবন দানে।।
আমার যা আছে তোমায় সব কৈনু দান।
তোমার লাগিয়া পারি ত্যাজিতে পরাণ।।
তুমি আমার ধরম করম তুমি গলার মালা।
তোমারে না দেখলে আমার মন হয় যে উতালা।।
প্রাণে বাঁচাও মোরে কন্যা খাও মোর মাথা।

আমার দুঃখেতে দেখ ঝরে বৃক্ষের পাতা।।"[২]

এর উপর গোয়ালিনীর নানান কথার চাতুর্য যোগ হয়েছে। তবু মন টলেনি কমলার। উপরন্তু কমলা যারপরনাই মারধোর করেছে চিকন গোয়ালিনীকে। কারকুনকে মাছি, ব্যাং, কুকুর ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করেছে। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কারকুন জমিদারের কাছে এক পত্র লিখে জানিয়ে দিল যে, কমলার পিতা মাণিক চাকলাদার মাটি খুঁড়ে ঘড়া ঘড়া মোহর পেয়েছে, অথচ জমিদারকে জানায়নি, একাই ভোগ করছে। এর ফলে জমিদার চাকলাদারকে বন্দী করেছে। তাকে উদ্ধার করতে উস্কানি দিয়ে তাকেও বন্দী করিয়েছে কারকুন, নিজে লাভ করেছে চাকলাদারি। সমস্ত প্রকার চেষ্টা করেও যখন কারকুন কমলাকে লাভ করতে পারল না, কমলা আশ্রয় নিল মামার বাড়িতে; তখন কমলার নামে চরিত্রহীনতার অভিযোগ জানিয়ে কমলার প্রবাসী মামাকে পত্র লিখল যেন কমলাকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, জমিদারের হুকুম বলে একপ্রকার শাসানিও দিয়ে রাখল :

"কলঙ্কিনী কমলারে যেবা দিবে স্থান।
জন বাচ্চা সহিতে তার যাইব গর্দ্দান।।"[৩]

খুব স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ ছাপোষা গৃহস্থ কমলার মামা নিজের স্ত্রীকে সেই মোতাবেক পত্র পাঠাল। সহানুভূতিশীল মামী সেই কাজ না করলেও কমলার হাতে পড়লো সেই চিঠি। সে নিজেই ঘর ছেড়ে পথে নামলো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মহিষাল ও জমিদারপুত্র প্রদীপকুমারের সাহায্যে সব সমস্যার সমাধান হল। কারকুনের পাঠানো প্রেমপত্র ও তার বাহক চিকন গোয়ালিনীর সাক্ষ্যে প্রমাণিত হল কারকুনের ষড়যন্ত্র। তার শাস্তি হল নরবলি। মুক্তি পেল চাকলাদার ও তার পুত্র। কমলার বিবাহ হল প্রদীপকুমারের সঙ্গে। তাই 'কমলা' পালার কাহিনির আদ্যোপান্তে কারকুনের প্রেমপত্রটির গুরুত্ব যথেষ্ট।

।৪।

'দেওয়ান-ভাবনা' পালায় নায়ক মাধব খুবই আবেগাপ্লুত ভাষায় নায়িকা সুনাইকে পত্র লিখেছে। মনের কথা বলার জন্য সে সুনাইকে আহ্বান জানিয়েছে গাঙ্গের পাড়ে জলের ঘাটে। সেখানে কেওয়া পুষ্পের বনে নিরিবিলিতে প্রেমালাপে মত্ত হতে চায়। শুধু কথায় ভোলাতে ব্যস্ত নয় মাধব, কিছুটা আর্থিক প্রলোভনও দেখায়, ঠারেঠোরে জানিয়ে দেয় তার সমৃদ্ধ অবস্থার কথা:

"বাপের আছে ধন-দৌলত কন্যাগো লাখের জমিদারী।
তোমারে দিয়াম কন্যাগো অগ্নিপাটের শাড়ী।।
... ...
বাহুতে পড়াইয়া দিবাম বাজুবন্ধ তার।
হীরামতি দিয়া দিবাম তোমার গলার হার।।"[৪]

নানান স্বপ্নে সুনাইকে বিভোর করে তুলতে চায় মাধব। সুনাইকে নিয়ে সে সাঁতার কাটবে বাড়ীর কাছে বাঁধা পুকুরে, নিশিত রাতে ঘরের ভিতরে খেলবে পাশা। আর বাসরে শেখাবে 'রতিকলা'। এক কথায় সুনাইকে সে সব কিছুই দিতে চায় –

"ধন দিবাম দৌলত দিবাম আর দিবাম পরাণ।
খুশী মনে করলো কন্যা মোরে যৌবন দান।।"[৫]

প্রেম-প্রকাশের ভাষায় সুনাইও কম দড় নয়। নিজের অবলা ভাব তথা অসহায়তার কথা যেমন জানিয়েছে তেমনি উন্মুক্ত করে দিয়েছে হৃদয়ের উদ্দাম গতিকে –

"ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধুরে যদি কেওয়াবনে।

নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে।।
তুমি যদি হইতে রে বন্ধু আসমানের চান।
রাত্র নিশি চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান।।
তুমি যদি হইতে রে বন্ধু ঐ সে নদীর পানি।
তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণি।।"[৬]

সুনাই-এর বুদ্ধিমত্তার ও দূরদর্শিতার পরিচয়ও পাওয়া যায় এই পত্রে। সে মাধবকে সল্লার কাছে তার মনের কথা বলতে বলেছে, দূতীর আঁচলে বেঁধে দিয়েছে ভেট, 'মেলানি'। দুর্জন বাঘরার কু-মন্ত্রণায় ভাটুক ঠাকুর ভাগ্নি সুনাইকে তুলে দিতে চাইলো দেওয়ান ভাবনার হাতে। উদ্ধার পাওয়ার জন্য সল্লা দূতীর মাধ্যমে পত্র পাঠায় মাধবের কাছে। এখানে কি মহাভারতের কৃষ্ণের কাছে রুক্মিণীর আবেদনের প্রভাব পড়েছে? নায়কের নাম-সাদৃশ্যে ব্যাপারটি আরও আস্বাদ্য হয়ে ওঠে (কৃষ্ণেরও আরেক নাম মাধব!)। কৃষ্ণের মতোই মাধব উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

।৫।

সংখ্যার বিচারে নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত 'চন্দ্রাবতী' পালায় সবচেয়ে বেশি পত্র ব্যবহৃত হয়েছে – ৬টি, সবগুলিই প্রেমপত্র। প্রথম পত্রে নায়ক জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর রূপে বিমুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করেছে। সহানুভূতি পাওয়ার আশায় নিজের দুঃখের কথাও জানিয়েছে।

"মাও নাই বাপ নাই থাকি মামার বাড়ী।
তোমার কাছে মনের কথা কইতে নাহি পারি।
যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্দবদন।
সেইদিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন।।
তোমার মনের কথা আমি জানতে চাই।
সর্বস্ব বিকাইবাম পায় তোমারে যদি পাই।।"[৭]

এমন প্রাণের আকুতি পড়তে পড়তে চন্দ্রাবতীর হৃদয় কি আর না গলে পারে? সে তো অনুভূতিশীল উঠতি যুবতী। তাই–

"পত্র পড়ে চন্দ্রাবতীর চক্ষে বয়ে পানি।
কিবা উত্তর দিব কন্যা কিছুই না জানি।।
আর বার পড়ে পত্র চক্ষে বয় ধারা।
'এমন কেন হইল মন ককের পিঞ্জরা।।' "[৮]

নারীর প্রেম প্রকাশের স্বাধীনতা সমাজ কখনই দেয়নি। সেই প্রথার পিঞ্জরে বন্দী চন্দ্রাবতীর যন্ত্রণা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাল্যকাল থেকে যে জয়ানন্দের প্রতি সে আত্মনিবেদিত তার প্রেমকে অস্বীকার করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা তার নেই। কিন্তু সে দিশাহীন, তাই তার প্রত্যুত্তর-পত্র মাত্র দু-লাইনের :

"ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেমন দেই উত্তর অবলা কামিনী।।"[৯]

ঘটনাচক্রে জয়ানন্দের সঙ্গে বিয়ের আয়োজন শুরু হলেও নিজের প্রেমের পথ থেকে পিছলে পড়ে জয়ানন্দ। এক মুসলমান কন্যার রূপে আচমকাই মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তাকে নিবেদন করে বসে প্রেম। এক পত্র লিখে রেখে দেয় ইজল গাছের মূলে। এই পত্রের সাক্ষ্যে আশমানীর ইচ্ছায় কাজী জোর করে তাকে ধর্মান্তরিত করে ঐ রূপবতী মহিলার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছে। চন্দ্রাবতী এই খবর শুনে শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

প্রতিজ্ঞা করে সে আর কাউকে বিবাহ করবে না। পিতার পরামর্শে ধ্যানজ্ঞান করে শিবপূজা ও রমায়ণ রচনা। ইত্যবসরে দেখা যায়, অল্পদিনেই জয়ানন্দের রূপের মোহ কাটে। অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে পত্র লেখে চন্দ্রাবতীকে:

"শুনরে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই।
মনে আগুনে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই।।
অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল-হলাহল।।
জানিয়া ফুলের মালা কালসাপ গলে।
মরণে ডাকিয়া আমি আন্যাছি অকালে।।
তুলসী ছাড়িয়া আমি পূজিলাম সেওড়া।
আপনি মাথায় লইলাম দুঃখের পসরা।।
জলে বিষ বাতাসে বিষ না দেখি উপায়।
ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী ধরি তোমার পায়।।"[১০]

জয়ানন্দ আবার চন্দ্রাকে ফিরে পাওয়ার অভিলাষ করে না, শুধু একবার শেষ দেখা দেখতে চায়। নিজের পাপিষ্ঠ দেহকে সে আর বয়ে বেড়াতে পারছে না। তার আবাল্যশৈশবের সঙ্গীকে জানাতে চায় বিদায়। এই কাতর আবেদনে বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায় চন্দ্রার। কিন্তু পিতার পরামর্শক্রমে সে বিশ্বাসঘাতকের পত্রকে আর বিশ্বাস করলো না। মনের কথা সাফ জানিয়ে দিল পত্র মারফত। একেবারে আত্মনিবেদিত হল শিবের মন্দিরে। বিফলে গেল শিবের মন্দিরের দরজায় শত করাঘাত ও জয়ানন্দের আহ্বান, আর্ত চিৎকার। শেষ পর্যন্ত মন্দিরের কপাটে মালতীফুলের রস দিয়ে লিখে গেল চির-বিদায়পত্র :

"শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী।।
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত।
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত।।"[১১]

।৬।

'বীরাঙ্গনা কাব্য'-তে আমরা দেখতে পাই, কোনো নায়িকা পত্র লিখেছেন কমলদলের সাহায্যে কমলপত্রে (শকুন্তলা পত্রিকা– 'লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী'); কেউ বা নয়ন কাজলের সাহায্যে ফুলবৃন্ত দিয়ে (তারা পত্রিকা– 'লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে/ লিখিনু!'); কেউ বা আবার বুকের রক্ত দিয়ে পত্র লিখেছেন (কেকয়ী পত্রিকা – 'চিরি বক্ষ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে/ লেখন।')। লিখন-প্রক্রিয়ার এই বৈচিত্র্য তাদের মানসিক অবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভর করেছে। এটাই স্বাভাবিক। আজকের দিনেও আমরা মাঝে মাঝে শুনতে পাই 'প্রেম-দিওয়ানা' কোনো বালক-বালিকা বা যুবক-যুবতী নিজের রক্ত দিয়ে মন্দির গাত্রে বা বিশেষ কোনো স্থানে তার কাঙ্ক্ষিত দয়িত বা দয়িতার নাম লিখে থাকে। ময়মনসিংহ-গীতিকা-তেও আমরা দেখতে পাই পত্র রচনা প্রক্রিয়ার নানান বৈচিত্র্য। 'দেওয়ান ভাবনা'-তে মাধবকে বলতে শুনি– 'কালি দিছলাম পত্রলো ঐ না পদ্মের পাতে।'[১২] অর্থাৎ, সে পত্র লিখেছে পদ্মের পাতায়। উত্তরে সুনাই যে পত্র রচনা করে তা রীতিমতো অভিনব– 'চন্দন ফুলের মালা তার পত্রখানি'[১৩]। সুনাই-এর পত্র বাহক সল্লা দূতী হলেও মাধব নিজেই নিজের পত্র বহন করে পৌঁছে দেয় সুনাইকে। 'কমলা' পালায় কারকুনের প্রেমপত্র কমলার কাছে নিয়ে যায় চিকন গোয়ালিনী। পত্রবাহক হিসেবে চিকন গোয়ালিনীকে পেতে কম পরিশ্রম করতে হয় না

কারকুনকে। রীতিমতো হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হয় তার বাড়ী। অনেক রূপ ও স্বভাবগত প্রশংসাতেও যখন মন ভেজে না তখন অর্থ খরচও করতে হয়–

"মার আর কাট লইলাম তোমার আশ্রয়।
কর মোরে বধ যদি সমুচিত হয়।।
এতেক বলিয়া কারকুন কি কাম করিল।
একশ টাকা গন্যা গোয়ালিনীর হস্তে তুল্যা দিল।।"[১৪]

'চন্দ্রাবতী' পালায় জয়ানন্দ প্রথম প্রেমপত্র লেখে 'পুষ্পপাতে'[১৫]। নিজেই গিয়ে পুষ্পক্ষেত্রে দেয় পুষ্পচয়নরতা চন্দ্রাবতীকে। জয়ানন্দ জানে চন্দ্রার পিতা খুবই নিয়মনিষ্ঠ, তথা কড়া ধাতের। তাই কি তার এহেন ব্যবস্থাপনা? জয়ানন্দ মুসলমান কন্যাকেও সরাসরি প্রেমপ্রস্তাব দিতে না পেরে পত্র লিখে রাখে 'ইজল গাছের মূলে'[১৬]। জয়ানন্দের শেষ পত্রটির লিখনস্থান ও লিখনকৌশল খুবই ব্যঞ্জনাবহ।

"না খোলে মন্দিরের দ্বার মুখে নাহি বাণী।
ভিতরে আছয়ে কন্যা যৈবনে যোগিনী।।
চারিদিকে চাইয়া নাগর কিছু নাহি পায়।
ফুট্যাছে মালতীফুল সাম্নে দেখতে পায়।।
পুষ্প না তুলিয়া নাগর কোন কাম করে।
লিখিল বিদায়পত্র কপাট উপরে।।"[১৭]

চন্দ্রাবতী মন্দিরের কপাটে বিশ্বাসঘাতক প্রেমিক, ধর্মান্তরিত প্রেমিকের লিখন দেখে অন্তরে যতই দুঃখ পাক প্রথানিষ্ঠতার বশে মনে করে মন্দির অপবিত্র হয়ে গেছে। তাই তা মোছার জন্য কলশী নিয়ে জল আনতে যায় নদী-ঘাটে। নদীর জলে ভাসমান জয়ানন্দের মৃতদেহ দেখে উন্মত্ত হয়ে পড়ে–

"আখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
পাবেতে খারাইয়া দেখে উমেদা কামিনী।।"[১৮]

এইভাবে দেখা যায় পত্র ব্যবহার যেমন অনিবার্য হয়েছে, তেমনি পত্র রচনা কৌশল, পত্রপ্রেরণরীতি তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নানান দিকগুলিকে প্রস্ফুটিত করে। একইসঙ্গে বোঝা যায়, জাতধর্মের ঊর্ধ্বে মানবিক প্রেমের আবেদন শাশ্বত, চিরন্তন। প্রেমের পথে সামাজিক, ধর্মীয় বাধা যেমন ছিল, তেমনই ব্যক্তিগত প্রলোভন বা বিশ্বাসঘাতকতা এযুগের মতো মধ্যযুগেও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। নারীদের অবস্থান বর্তমানের কালগত মাপকাঠিতে বিচার করলে তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতাকে বোঝা যাবে না। তাই সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সমানুভূতিশীল হয়ে ময়মনসিংহ গীতিকার প্রেমপত্রগুলি অনুধাবন করতে পারলে তৎকালীন নারীদের হৃদয়চিত্রের অনেকখানি উপলব্ধি করা সম্ভব। বুঝে ওঠা সম্ভব আজকের নারী অনেক ঝঞ্ঝার পথ অতিক্রম করে আজকের নারী হয়ে উঠতে পেরেছে। এবং সেই পেরে ওঠার পথে বিস্তৃতহৃদয় পুরুষদের সহযোগ অনেকাংশে ক্রিয়াশীল থেকেছে।

তথ্যসূত্র:

১। চক্রবর্তী, বরুণকুমার। বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস। ষষ্ঠ পরিমার্জিত সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫০৮।
২। মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পাদিত)। ময়মনসিংহ-গীতিকা। ভারতী বুক স্টল, ৬ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, অক্টোবর ২০১২, পৃষ্ঠা ১৭৭।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১৮৯।
৪। তদেব, পৃষ্ঠা ২১৬।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা ২১৭।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা ২১৭।
৭। তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৭।
৮। তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৯।
৯। তদেব, পৃষ্ঠা ১৬০।
১০। তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৭।
১১। তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭০।
১২। তদেব, পৃষ্ঠা ২১৬।
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা ২১৭।
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৭।
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৭।
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৩।
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৯।
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা ১৭০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বিশ্বাস, অচিন্ত্য। লোকসংস্কৃতিবিদ্যা। অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ– আগস্ট ২০০৬
২. মিত্র (বিশ্বাস), অজন্তা। বাংলা গীতিকার রূপতাত্ত্বিক ও গঠনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, বইমেলা ২০০৯।
৩. সিদ্দিকী, আশরাফ। লোকসাহিত্য (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। পার্থশঙ্কর বসু। নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা ৬, প্রথম নয়া উদ্যোগ সংস্করণ, ২০১২।
৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোকসাহিত্য। দ্বিতীয় খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, ১৯৬৩
৬. চট্টোপাধ্যায়, তুষার, লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপসন্ধান, এ মুখার্জি অ্যান্ড প্রা. লিঃ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০২।
৭. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স। অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৩
৮. চৌধুরী, দুলাল (সম্পা)। বাংলার লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষ। আকাদেমি অব ফোকলোর। কলকাতা ৯৪, ২০০৪।
৯. সরকার, পবিত্র। লোক ভাষা সংস্কৃতি নন্দনতত্ত্ব। শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪।

১০. সেনগুপ্ত, পল্লব। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ। কুমকুম মাহিন্দার। পুস্তক বিপণি। ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০।

১১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। গীতিকার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, এপ্রিল ১৯৯৩।

১২. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ। অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা ৯, জুলাই ১৯৯৫।

১৩. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস। ষষ্ঠ পরিমার্জিত সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কুমকুম মাহিন্দার, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, জানুয়ারি ২০১০

১৪. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে। কুমকুম মাহিন্দার, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০১০

১৫. মজুমদার, মানস। লোকঐতিহ্য চর্চা। সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, নভেম্বর ২০১০।

১৬. মজুমদার, মানস। লোকঐতিহ্যের দর্পণে। সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, ১৯৯৩

১৭. ইসলাম, মকবুল। লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান তত্ত্ব। পদ্ধতি ও প্রয়োগ, দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ– রথযাত্রা ২০১১।